মালদহের চরবাসীদের নাম তালিকায় তোলার নির্দেশ কমিশনের

সংবাদ সংকলন : অবশেষে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মালদহের হামিদপুর চরের বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে চেষ্টার পর চরবাসীরা নাগরিকত্ব ফিরে পেতে সমর্থ হল। ভাঙনে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাওয়া কালিয়াচক (২) ব্লকের হামিদপুরের বাসিন্দারা বসতবাটি ও চাষের জমির সাথে নাগরিকত্বও হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্থানীয় গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। সরকারি নিস্পৃহতার শিকার হয়ে এতদিন তাঁরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ছিলেন।

■ সংবাদ সংকলন : পৃষ্ঠা ৬-৭ দেখুন

শিশুশ্রমিকের কাজে পাচারের আগে উদ্ধার হওয়া একদল শিশু

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১০

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হল কিষাণ স্বরাজ যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি অ্যালায়েন্স ফর সাসটেনেবল অ্যান্ড হলিস্টিক এগ্রিকালচার (ASHA) কিষাণ-স্বরাজ যাত্রা নামে একটি জাঠার আয়োজন করে জিএমও মুক্তকরণের প্রচারের ও ভারতবর্ষের কৃষি ও কৃষকদের অস্তিত্ব বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। যাত্রাটি শুরু হয় গত ২ অক্টোবর ও শেষ হয় ১১ ডিসেম্বর দিল্লির রাজঘাটে। দেশব্যাপি আয়োজিত এই জাঠায় অংশগ্রহণ করেন ৩০ জন সম্পদ কৃষক। জাঠাটি দেশের ২০টি রাজ্য ভ্রমণ করে। ১৭ নভেম্বর জাঠাটি কাঁথি শহরে পৌঁছায়। এই দিন পুরানো বীজ চাষের পদ্ধতি নিয়ে কাজলা জনকল্যাণ সমিতির প্রাঙ্গণে জৈব উপায়ে উৎপাদিত পণ্যের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, চাষিদের নিয়ে আলোচনা সভা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। এছাড়াও ১০-১৫টি গ্রামে সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পোস্টারিং, মন্ত্রীর কাছে দাবীপত্র পাঠানো হয়। স্থানীয় প্রেস মিট ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়। ১৮ তারিখে কর্মসূচিগুলি সম্পন্ন হলে জাঠাটি ওইদিন রাতে কলকাতায় পৌঁছায়। কলকাতায় এই জাঠার দায়িত্বে ছিলেন দেবল দেব ও সার্ভিস সেন্টার। ১৯ নভেম্বর কলকাতার YMCA-তে এ বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া একটি আলোচনাসভাও আয়োজিত হয়, যেখানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ বসু, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষকগণ, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ শ্রমজীবি মহিলা সংগঠন আলোচিত বিষয়গুলি নিয়ে একটি নাটক প্রদর্শন করে। এরপর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা অনুষ্ঠানস্থল থেকে পদযাত্রা করে মেয়ো রোডের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বিকাল ৩টে থেকে কলকাতার প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সকলে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক অংশুমান দাস, অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

কিষাণ স্বরাজ যাত্রা : বক্তব্য রাখছেন ডি রাজা ও মহেশ ভাট

কিষাণ স্বরাজ যাত্রা : কাঁথীতে আয়োজিত অনুষ্ঠান

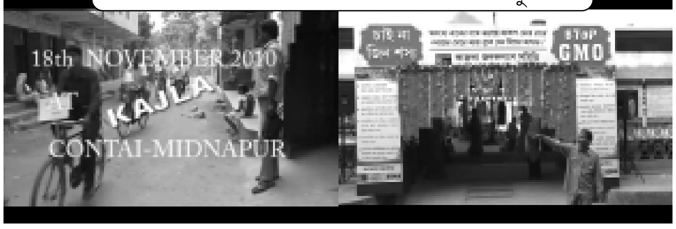

অনাহার : পাঁচ সন্তানকে বিক্রির অনুমতি চেয়ে আবেদন মায়ের

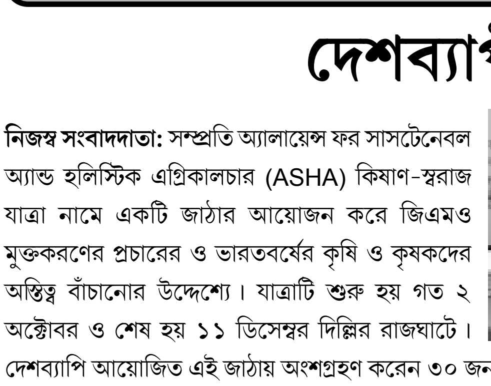

পাঁচ সন্তানকে নিয়ে মা সামিয়ারা বিবি। মঙ্গলবার। - হরেন চৌধুরি

বাবুল হক • মালদহ

স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন। রোজগারের ক্ষমতা হারিয়েছেন। সন্তান-সন্ততিদের ভাত জোটে না। অনাহার, অর্থাহারে দিন কাটে। মেলেনি সরকারি সাহায্য, কিংবা অনুদান। অবশেষে অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় নিজের পাঁচ সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অভাবী মা। শুধু তাই নয়, সন্তানদের বিক্রি করে দেওয়ার জন্য সরকারি অনুমতির আর্জি জানিয়ে বিডিওর কাছে দরখাস্তও দিয়েছেন মালদহ জেলার ওল্ড মালদহ ব্লকের সহায়সম্বলহীন মহিলা সামিয়ারা বিবি (৩৮) মঙ্গলবারই ব্লক প্রশাসনের কাছে সন্তান বিক্রির জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ঘটনা জানাজানি হতেই পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসনের কর্তারা চরম অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন জেলাশাসক প্রমল কুমার সামন্ত। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই 'সোনার বাংলা'য় অনাহারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন, অভাব আত্মহত্যা, কৃষকের আত্মহত্যা কিংবা অভাবের জ্বালায় সন্তান বিক্রির চেষ্টার ঘটনা নতুন নয়। কর্মসংস্থান দূরের কথা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়েও সরকারের চরম উদাসীনতা একের পর এক এমন ঘটনাগুলিতেই স্পষ্ট। মালদহের সামিয়ানা বিবির সন্তান বিক্রির চিন্তায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলাশাসক বলেন, ''সরকারি অনেক প্রকল্প রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন মানুষ না খেয়ে মরবেন, সন্তান বিক্রি করবেন। আমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছি।'' ওল্ড মালদহ ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের শাহনগর গ্রামে অন্যের বাঁশবাগানের মধ্যে ভাঙাচোরা একটি ঘরে সপরিবার বাস করেন সামিয়ারা। গৃহকর্তা আজিজুল হক দুই বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর চিকিৎসার খরচ জোটে না। তাঁদের তিন মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়ে

শেষাংশ ৩ পাতায়

শিক্ষার অধিকার আইন বলবৎ হবার পরেও স্কুলে শাস্তি চলছেই

■ ওয়েবেন : সাংগঠনিক রিপোর্ট ■

বাঁকুড়া : গত ২ **নভেম্বর,** বাঁকুড়া জেলার দলপুর আশ্রমে বসুদেব কুন্ডু মহাশয়ের সভাপতিত্বে জেলার কার্যনির্বাহী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :

০১. জেলা ও ব্লকের কাজের প্রতিবেদন, ০২. প্রাক নির্বাচন পর্বে প্রচার, শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ ও তার প্রয়োগ, ০৩. রাজ্য Capacity Building Workshop ও Model School Initiative Workshop-এ অংশগ্রহণ করার জন্য জেলা প্রতিনিধি নির্বাচন, ০৪. জেলার পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ ০৫. বিবিধ।

ব্লক থেকে আসা প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে, ব্লকগুলিতে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়ন ও এস. সি. পি. সি. আর. গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পোষ্টকার্ড পাঠানো, সদস্য সংগ্রহ করা এবং দু'টি জেলা কার্যনির্বাহি সমিতির সভা হয়েছে। সভায় উপস্থিত রাজ্য প্রতিনিধি বলেন, যে ৩টি ব্লকে কাজ চলছে সেই এলাকায় দৃষ্টান্তমূলক কিছু কাজ করতে পারলে জেলার কাজে গতি আসবে। তিনি আরো বলেন, ব্লক ও জেলাস্তরে ২০১০-১১ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠচক্র, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শিক্ষা ইস্যুতে সামিল করা, সদস্য / সদস্যাদের জন্য Information Register তৈরি করা, সব জেলায় একটি গ্রাম চিহ্নিত করে ১০০ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য ওকালতি করা, স্কুল পরিচালন কমিটি ও পঞ্চায়েত, শিক্ষক ইউনিয়ন, S.I.-দের সঙ্গে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর প্রয়োগের জন্য ওকালতি করা - এই কাজগুলি করা যেতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত জেলা সদস্যদের নিতে হবে কোনটা করবেন। ১৪ নভেম্বর শিশু অধিকার দিবসের কর্মসূচি গ্রহণেও তিনি আবেদন জানান।

আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয়, ৩টি ব্লকের ৬০টি স্কুলে (প্রত্যেকটি ব্লকের ৫টি করে গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে ৪টি করে স্কুল), স্কুলছুট ও শিশুশ্রমিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভের কাজ করা হবে এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্য নিয়ে আগামী ৭ ডিসেম্বর জেলা সভাধিপতি ও জেলার শিক্ষা কর্মাধক্ষ্যদের সঙ্গে জেলার ৫ জনের প্রতিনিধি দল আলোচনা করবেন এবং শিক্ষা অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য দাবী পেশ করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও আগামী ২৬ নভেম্বর ২০১০ জেলা পাঠচক্রের আয়োজন করা হবে (স্থান: ইন্দাস, বিষয় : শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯)। আরও সিদ্ধান্ত হয়, রাজ্য অফিস থেকে প্রাক নির্বাচনী প্রচার বিষয়ে ইস্তাহার পাওয়ার পর এ বিষয়ে প্রচারের কাজের পরিকল্পনা করা হবে। এছাড়া আগামী ১১, ১২ ও ১৩ নভেম্বর Workshop on Model School Initiative-এ অংশগ্রহণের জন্য তাপস মাহাতো এবং ১৯, ২০ ও ২১ নভেম্বর রাজ্য Capacity Building Workshop-এ অংশগ্রহণের জন্য সুভাষ চন্দ্র কর ও ইন্দাস ব্লকে একজন যোগ্য ব্যক্তির নাম পরে ঠিক করে পাঠানো হবে বলে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়।

বর্ধমান : গত **৩ নভেম্বর** তারিখে আবু তৈয়বের সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় বিঘা বিক্রমশীলায়। সভায় মোট ৫টি ব্লকের (মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী ১ এবং ২, কেতুগ্রাম ১ এবং ২) ১৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে রাজ্যস্তরে ওয়েবেন-এর পক্ষ থেকে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং নাফরে মূল্যায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও আগামী দিনে যে সকল সম্ভাব্য কর্মসূচি জেলাস্তরে এবং ব্লকস্তরে নেওয়া সম্ভব সে বিষয়েও আলোকপাত করেন। আলোচনার ভিত্তিতে সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা নিম্নরূপ:

- আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক সদস্যদের নিয়ে বিক্রমশীলায় যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে বর্ধমান জেলার পক্ষে পূর্বস্থলী-২ ব্লকের আবু তৈয়ব অংশগ্রহণ করবেন।
- গ্রামসংসদ ও গ্রামসভায় যে সকল ব্লকে সম্ভব হবে সেখানে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলেচনা হবে।
- **১৪ নভেম্বর :** প্রতিটি ব্লকেরই গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচার করা হবে
- **২৩ নভেম্বর :** ব্লকস্তরে প্রশাসনের সাথে শিক্ষালভ্য এবং বিদ্যালয়ে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের বিষয়ে ওকালতি করা হবে
- **২৫ নভেম্বর :** জেলাস্তরে প্রশাসনের সাথে শিক্ষালভ্য এবং বিদ্যালয়ে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের বিষয়ে ওকালতি করা হবে
- **২৮ নভেম্বর :** শিশু সম্মেলন করা হবে
- **১২ ডিসেম্বর :** জেলাস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঁচটি ব্লকে র‍্যালি হবে

এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করা হবে প্রতিটি ব্লকে এবং ধারাবাহিকভাবে স্কুলছুট বাচ্চাদের তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তাদেরকে স্কুলে ভর্তি করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের জন্য ব্লক সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মশালা

বর্ধমান : গত **১১-১৩ নভেম্বর** ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এবং বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির সহযোগিতায় বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের বিঘা 'বিক্রমশীলা'তে ওয়েবেন-এর ব্লক সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তিনদিনের এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির প্রোগ্রাম ম্যানেজার অতনু সাঁই।

কর্মশালার শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় পর্বের পর দলগত ভিত্তিতে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের সংক্ষেপিত রূপ দিয়ে তার সম্পূর্ণ নাম এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কাজ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন, এন.সি.ই.আর.টি., ডিপিইপি, এন.এফ.ই., এন.এল.এম., এন.সি.টি.ই., ডি.আই.ই.টি। বি.আর.সি., সি.এল.আর.সি., এম.এইচ.আর.ডি., এন.সি.এফ., এস.এ.পি., দলগত আলোচনার পর প্রতিটি দল সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বলেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের কাছে শিক্ষার গুণমান বলতে কি বোঝায় তা জানতে চাওয়া হয় এবং সকলে মিলিতভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এরপর বর্তমানে পাঠ্যবই-এর প্রথমে সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত নানা শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়। যথা সার্বভৌম,গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি। প্রশিক্ষক মহাশয় বলেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করছেন আগামী দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার রাজনীতি ও তার গুরুত্ব আলোচনা করেন এবং উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেন একটি শব্দ কোনোও গোষ্ঠীর শব্দভান্ডার থেকে বাদ দিলে তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কত শব্দকে মূল্যহীন করে দেয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য বিষয়ে প্রশ্ন করলে বুদ্ধিমত্তার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন, ভাষাগত বুদ্ধিমত্তা, তার্কিক বুদ্ধিমত্তা, দৃশ্যগত বুদ্ধিমত্তা, সাংগীতিক বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি।

বর্তমানে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান নির্মাণকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশিক্ষক মহশয় জানান।

আদর্শ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দিক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিখন পদ্ধতি, ছাত্র ও শিক্ষকের সাফল্য, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে মানবিক গুণ, মূল্যবোধ,গুণমানের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা হয়। এরপর তিনটি দলে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরে গড়ে কত টাকা ব্যয় হয় তা জানার চেষ্টা করেন এবং ফিরে এসে তা ব্যাখ্যা করেন। দেখা যায় **মোট বরাদ্দের ৮৩.৫৬ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতনের জন্য। বিদ্যালয়ের ভৌত পরিকাঠামোর জন্য ব্যয় হয় ১.৩৯ শতাংশ, শিখন পদ্ধতির জন্য ব্যয় হয় ২.৪৩ শতাংশ, দুপুরের খাবারের জন্য ব্যয় হয় ১২.৬০ শতাংশ**। এর মধ্যে রাজ্য সরকার খরচ করে ৮৬.২৮ শতাংশ এবং কেন্দ্র সরকার খরচ করে ১৩.৭২ শতাংশ।

প্রশিক্ষক মহাশয় বলেন, আদর্শ বিদ্যালয় গঠন করতে গেলে পরিকল্পনা প্রাথমিকস্তর থেকেই শুরু করা দরকার। বাৎসরিক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (District Elementary Education Planning) প্রতি বছর যখন হয় সেই সময় থেকেই কাজ শুরু করা প্রয়োজন। তিনি বলেন জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ওকালতির কাজেই ওয়েবেন-এর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মূল্যবোধ সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাজারী মূল্যবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ-এর পার্থক্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বাজারি মূল্যবোধ প্রতিরোধ-এ শিক্ষার গুরুত্ব এবং সে শিক্ষায় যে বিষয়গুলি দেখা দরকার তা হল, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশ্লেষণী দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ ক্ষমতার দক্ষতা, কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করার দক্ষতা, সৃজনশীলতা চর্চা, পারস্পরিক সম্পর্ক গড়া ও নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়া বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই প্রতিটি বিষয়েই তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন তিনি বলেন, আমাদের উচিত পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করা এবং জীবনকেন্দ্রীক ও পরিবেশ কেন্দ্রীক পাঠ্যবই ও শিক্ষাক্রম চালু করা। বর্তমান পৃথিবীর আর্থসামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করে সম্পদ বন্টনের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য শ্রেণি অনুযায়ী বিপরীতমুখী হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ১৯৯২ সালে ইউনেস্কোর রিপোর্ট ও DELORS Committee - প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। জানার জন্য শিক্ষা, কাজের জন্য শিক্ষা, একসাথে বসবাস করার জন্য শিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ, সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা, অন্যের প্রতি দায়বোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

বিদ্যালয়ে শাস্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যালয়ে এবং শ্রেণিকক্ষে ক্ষমতার গঠনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রচলিত কাঠামোর পরিবর্তনের কথা বলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের সাথে ওকালতির প্রয়োজনের কথা বলেন। পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

তাঁর পরামর্শ আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা তৈরির পরিকল্পনা করার সময় যাতে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ যোগ্যতা, সম্ভাব্য, বাস্তবসম্মত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা যায় তা দেখা প্রয়োজন।

তাঁর মতে, সমতার দৃষ্টিতে সব কিছুকে বিচার করে দেখতে হবে। একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করা প্রয়োজন এবং তার জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা দরকার। যে যে বিষয়গুলিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা হল - পরিকল্পনা এবং পরিচালনা, সংস্কৃতি, সম্পর্ক, শিখন পদ্ধতি, মূল্যায়ন, পাঠ্যক্রম। এজন্য বিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত ছাত্র-ছাত্রী,শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বিদ্যালয় উন্নয়ন ও পরিচালন কমিটি সকলের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠান, চক্র সম্পদ কেন্দ্র, বিদ্যালয় পরিদর্শক সকলের সাথে আলেচনা। এজন্য গ্রাম বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন ধরনের মানসিকতার মানুষের সাথে সম্পর্ক গঠনে কিভাবে কৌশল নেওয়া প্রয়োজন তা উদাহরণ সহযোগে তিনি ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ওয়েবেন-এর আন্দোলন কার্যক্রম

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন

শিশুসুলভ শ্রেণিকক্ষ ও শিশুদের উপযোগী বসার ব্যবস্থার দাবিতে অভিভাবক কমিটির আন্দোলন : কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো হলেও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিশুদের উপযোগী বসার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে মেঝেতে বসে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর হঠাৎ করে উঁচু, বড় পায়াওলা বেঞ্চিতে ওইটুকু শিশুরা কিভাবে সুরক্ষিতভাবে বসে শিক্ষালাভ করতে পারে সে প্রশ্নে অভিভাবকেরা সোচ্চার হয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলিকে শিশু উপযোগী, শিশু মনোযোগ আকর্ষণকারী করার অনুরোধ জানিয়ে এবং বিদ্যালয়ভবনগুলিকে শিশুদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য মহাশয়দ্বয়ের কাছে কাঁথি-৩ নং ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্কের তরফে দাবি পেশ করা হয়েছে।

শিক্ষার সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা : শুধুমাত্র বই পরিবর্তন হওয়ার কারণে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষালাভ বাধাপ্রাপ্ত এবং সমাপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ সমাজ থেকে হারিয়ে গিয়ে সে পরিণত হয় শিশুশ্রমিকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই মানসিকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্রমশ: প্রতিবাসী ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কাঁথি-৩ নং ব্লকের ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রতিনিধিদল ব্লকের সভাপতি মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। সভাপতি অর্ধেন্দু পন্ডা মহাশয় তাঁদের বক্তব্য শুনেছেন এবং প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েছেন।

বই পরিবর্তন প্রথার বিরুদ্ধে অভিভাবকদের প্রতিবাদ : কাঁথি-৩ নং ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে ব্লকস্থিত ভাজাচাউলি, কুসুমপুর, লাউদা, মারিশদা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতাধীন এলাকাগুলি থেকে অভিভাবক-অভিভাবিকারা একত্রিত হয়ে যৌথভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির বাৎসরিক বই পরিবর্তন প্রথার বিরুদ্ধে, শিক্ষকসমাজের প্রকাশক গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পনের প্রতিবাদে অভিভাবকবৃন্ধের যৌথ কমিটি কাঁথি-৩ নং ব্লকের সভাপতি অর্ধেন্দু পন্ডা, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারি নিশান্ত মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য চন্দন মান্না প্রমুখের কাছে তাঁদের অভিযোগ সম্বলিত দাবিপত্র গণস্বাক্ষর করে জমা দিয়েছেন।

প্রশাসনিকভাবে বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে কমিটির তরফে ইভারানী দে, গীতা বারিক, সুকুমার দে প্রমুখ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কবিতা

শিশুর প্রতি কবির কথা

কিশোর কবির শপথ ছিল
এই পৃথিবীটাকে
বাসযোগ্য ক'রে যেতে আমাদেরই জন্য
শান্তি এবং সুখে ভরা সুন্দর অনন্য
তাইতো মোরা শিশুর দল
সেলাম জানাই তাঁকে

শিশুর শ্রমে মুনাফাখোর
টাকার পাহাড় গড়ে
এসব কথা ভাবতে গিয়ে
শিউরে ওঠে মন —
প্রতিবাদও করছি ঘৃণাভরে।

শিশুর পেটে মারছে যারা লাথি
কখনও কি বুঝবে তারা রবি কবির কথা —
আমরা হ'লেম সরল শিশু ভোলানাথের জাতি?

সব দেশেরই শিশুই হল জাতির ভবিষ্যৎ
তাদের প্রাণে মেরে
কখনও না উঠবে গ'ড়ে কোথাও কোনো দেশে
উন্নয়নের আকাশ ছোঁয়া বিশাল ইমারত।

আজ অনেকেই দুঃখে কষ্টে বাঁচি
তবুও আশা - সত্যি হবে কিশোর কবির কথা —
সেই ভরসায় আছি।

লালকমল আর নীলকমলের বেশে
বাঁচার মতো বাঁচতে যে চাই
'সব পেয়েছির দেশে'।

কবির কথা হয়না বৃথা রাখি যে প্রত্যয়,
মোদের সুদিন আসবে সেদিন আসবেই নিশ্চয়।

■ বলাই লাল ত্রিপাঠী

শিশু শ্রম ও সরকার

পিতামাতার ইচ্ছা হয়ে ছিলাম বুকের মাঝারে,
ভগবানের আশিস নিয়ে এলেম তাঁরি সংসারে।
মাতৃসুধায় বাঁচা বাড়া ভবিষ্যৎকে ঘিরে,
মান অভিমান হাসি কান্না পিতামাতার তরে।
শিশুমনের অবাক করা দিবা-রাত্রি তারা,
পাহাড়-নদী-সাগর-আকাশ-চন্দ্র-সূর্য ভরা।
বাড়তে আমি চাইছি দেশে পাঁচটি শিশুর মত,
বিশ্বকবি রবি-নজরুল আদর্শবাদের পথ।
ছুটব-খেলব-নাচব-গাইব জানব লেখাপড়া,
বার-ষোলটি পণ মেনে দিবে না কেউ বেড়া।
তবু, গণতন্ত্রের নামে সুবিধাবাদী মানুষ,
শোষণ-তোষণ-নির্যাতনে ওড়ায় কপট ফানুস।
বেশি লাভের লোভে যারা খাটায় শিশুগণে,
দুখী পিতামাতার লাগি কাঁদে শৈশব মনে।
চায়ের দোকান, মিষ্টিমুখ, মোটরগাড়ি গ্যারেজে,
গৃহভৃত্য, ঠিকায়খাটা, ইটভাটার কাজে।
বাদাম-বিড়ি ফ্যাক্টরি সাথে কাঁচকাটা ও চুড়ি,
দেশলাই-বাজি কারখানাতে দেয় সস্তা মজুরি।
হোটেল-রেঁস্তোরা-ভিক্ষাবৃত্তি আর হকারি,
তার সাথে পকেটকাটা শেখে কেপমারি।
তেরটি পেশায় খাটে এমন যত শিশুগণ,
তাদের পাশেই সরকার-আর মানুষজন।
সবাই মোরা শিশুদিবসে শপথ করে যাব,
সজাগ হয়ে ভাববো কবে শৈশব ফিরে পাব।

■ হরিপদ গিরি

সংবাদ সংকলন

দু'বছরের শ্রম সমীক্ষায় শিশু শ্রমিক মাত্র ৪৯ জন

সুকান্ত সরকার

২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে আট লক্ষ। বিগত ১০ বছরে সেই সংখ্যাটা বেড়ে অন্তত ১০ লক্ষ হয়েছে বলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মত। অথচ রাজ্যের শ্রম দফতর ২০০৭ ও '০৮ - দু'বছরে অসংখ্য বার অভিযান চালিয়ে সাকুল্যে নাকি ৪৯টি শিশু শ্রমিকের সন্ধান পেয়েছে। শ্রম দফতরের ২০০৮ ও '০৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টেই এই তথ্য উঠে এসেছে।

রাজ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সত্যিই এতটা কমে গিয়েছে কি? সংখ্যাটা এতখানি কমে গিয়ে থাকলে কোন যাদুমন্ত্রে সেটা সম্ভব হল?

সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অনাদি সাহু। তবে তাঁর বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, নানা ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের উপস্থিতির কথা জেনেও তাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার তৎপর নয়।

কেন সেই তৎপরতা নেই?

শ্রমমন্ত্রী বলেন, ''শিশু শ্রমিক চিহ্নিত করার জন্য যদি বেশি অভিযান চালানো হয়, তা হলে বলা হবে শ্রম দফতর 'ইনস্পেক্টর রাজ' চালাচ্ছে।''

তা হলে শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার বা পুনর্বাসনের কী হবে? মন্ত্রী জানান, উদ্ধার করা শিশু শ্রমিকদের জন্য এ-পর্যন্ত ছ'টি জেলায় আবাসিক বিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। সেখানে তাদের নিখরচায় থাকা, খাওয়া, পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। সব জেলায় অন্তত একটি করে আবাসিক বিদ্যালয় গড়ার কাজ হাতে নিয়েছে শ্রম দফতর। অনাদিবাবুর মতে, শিশু শ্রমিক গোটা দেশের সমস্যা। আর্থ-সামাজিক কারণেই এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও একটি রাজ্যের শ্রম দফতরের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। শ্রমমন্ত্রী মনে করেন, দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না-হলে এই সমস্যা বেড়েই চলবে।

কিন্তু শ্রম দফতর রাজ্যের অসংখ্য শিশু শ্রমিকের হদিস পায় না কেন, স্বভাবতই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। তাদের মতে, রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য শুধু অবিশ্বাস্য নয়, হাস্যকরও বটে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী রশ্মি ঝা বলেন, ''কেবল বারাসত-২ নম্বর এবং হাড়োয়া ব্লকের ৪৭টি ইটভাটাতেই কাজ করে কম বেশি চার হাজার শিশু শ্রমিক। রাজ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ইটভাটা রয়েছে। এবং অধিকাংশ ইটভাটাতেই শিশু শ্রমিক।'' এছাড়া বাজি কারখানা, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, চা-বাগান, চাষের মাঠ, মোটর গ্যারাজ, চামড়া কারখানা - সর্বত্র সহজেই দেখা মেলে শিশু শ্রমিকদের।

অন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী নব দত্তের মতে, সরকার ইচ্ছে করেই সংখ্যাটা কমিয়ে দেখায়। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শিশু শ্রমিককে মুক্ত করে তাদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে রাজ্য সরকারকে প্রতিটি শিশু শ্রমিক-পিছু ১০ হাজার টাকা খরচ করত হবে। ''সেই কারণেই সরকারি কর্মীরা হাজার অভিযান চালিয়েও শিশু শ্রমিক খুঁজে পান না,'' বললেন নববাবু।

- আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮.১১.১০

অসহায়দের দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে ব্যর্থ 'সহায়'

স্বপন সরকার

অসহায়দের জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর চালু করেছিল 'সহায়'। কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পটি তার নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে পারেনি।

রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল, সহায়-সম্বলহীন মানুষদের কাছে রান্না খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে। অশক্ত, পঙ্গু মানুষ বাড়ি বসেই দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত রাজ্যের মাত্র ২২.১৪% গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ করা গিয়েছে। রাজ্য সরকার এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। তাতেই যে এই প্রকল্পের কাজ তরতরিয়ে এগোবে, সরকারি কর্তারাও এমন ভরসা দিচ্ছেন না।

২০০৫-'০৬ সালে এক সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্যে ৩.৫৮% পরিবার এক বেলাও খাবার জোগাড় করতে পারে না। কোনও মতে এক বেলা খায় ১১,৫৪% পরিবার। এই সমীক্ষার পরে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর ২০০৮ সালে এই পরিবারগুলির খাদ্যের সংস্থান করতে 'সহায়' প্রকল্প চালু করে। দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির জন্য খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সমস্যার সুরাহা করতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে দায়িত্ব দেয়। কথা ছিল, এই পরিবারগুলির কাছে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে। কোথাও কোথাও এই কাজ করা গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই রান্না করা খাবারের বদলে শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। কোথাও আবার নগদ টাকা দিয়ে দায় সারা হচ্ছে।

চলতি বছরের জুন মাসে পঞ্চায়েত দফতরের সচিব ত্রিলোচন সিংহ জেলায় 'নোট' পাঠিয়ে বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। এই সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও জেলায় এই কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ আশানুরূপ নয়। আবার কোনও জেলায় কিছু কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ওই নোটে আরও বলা হয়েছে, 'কোথাও কোথাও স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে রান্না করা খাবার দেওয়ার পরিবর্তে শুকনো খাবার বা নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছে।'

চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের হিসাবে, সব থেকে খারাপ অবস্থা হুগলি জেলার। এখানকার ১৮টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে মাত্র ১টিতে এই প্রকল্পের কাজ করা গিয়েছে। এর পরেই রয়েছে মুর্শিদাবাদ। সেখানে ২৬টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ২টিতে, উত্তর ২৪ পরগনায় ২২টির মধ্যে ৩টি এবং হাওড়ায় ১৪টির মধ্যে ৪টি পঞ্চায়েত সমিতিতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের মোট ৩৩৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ৭৪২টিতে এই কাজ করা গিয়েছে। তবে মাওবাদী সমস্যা জর্জরিত পশ্চিম মেদিনীপুরের ২৯টি ব্লকের মধ্যে ২৬টিতেই সহায় প্রকল্পের কাজ চলছে।

সরকারি এক কর্তার মতে, এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে কাজ হয়। এত সমস্যার মধ্যেও পশ্চিম মেদিনীপুরে এই প্রকল্পের কাজ অন্য সব জেলার থেকে ভাল হয়েছে। কারণ, ওখানে কাজ করতে রাজ্য তৎপর হয়েছে। অন্য জেলাগুলিতে সরকার সেই তৎপরতা দেখাতে পারেনি। পরিস্থিতি যে খুব ভাল নয়, তা মেনে নিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী আনিসুর রহমান বলেন, ''এই কাজে ঘাটতি আছে। জেলাগুলির সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব।'' দফতরের প্রতিমন্ত্রী বঙ্কিম ঘোষ বলেন, ''এর জন্য প্রয়োজন সহমর্মিতা। অর্থের অভাব নেই। এই প্রকল্পে প্রতিদিন জন প্রতি ২০ টাকা করে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা এখনকার দ্বিগুণ। প্রস্তাবটি অর্থ দফতরের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই তা মঞ্জুর হবে। কিন্তু দলমত নির্বিশেষে পঞ্চায়েতগুলি অসহায় মানুষদের সহৃদয়ভাবে দেখলে তবেই এই প্রকল্প সফল হতে পারে।''

- আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪.১১.১০

অসংগঠিত ক্ষেত্রে রাজ্যে ন্যূনতম মজুরি কম

নিজস্ব প্রতিবেদন : যতই কৃষক-শ্রমিক, সর্বহারাদের পাশে থাকার কথা বলুক না কেন বামেরা, বামশাসিত রাজ্যে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ আদৌ ভালো নয়। এ রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাত্র ৯৬ টাকা। যদিও দিল্লিতে এই মজুরির পরিমাণ সর্বাধিক ২০৩ টাকা। তবে বামশাসিত কেরলে কৃষিক্ষেত্রে অবস্থা অন্তত অনেকটা ভালো। সেখানে কৃষিক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিকরা ১৫০ থেকে ২০০ টাকা মজুরি পান। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থাটা অনেকটা এ রাজ্যের মতোই, তবে মজুরি সামান্য বেশি অর্থাৎ ১০০ টাকা। অন্য দিকে, অপর বামশাসিত রাজ্য ত্রিপুরায় কৃষিতে মজুরি ১০০ টাকা হলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থা বেশ খারাপ। মজুরির পরিমাণ মাত্র ৮১ টাকা ৫৪ পয়সা। বিহারের অবস্থা অনেকটাই ভাল এ রাজ্যের চেয়ে। কৃষিতে অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১১৪ টাকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরির পরিমাণ ১০৯ টাকা ১২ পয়সা। ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে গোয়া, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, আন্দামান নিকোবর রয়েছে ওপরের দিকে। এই সব জায়গায় ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ ১৫০ টাকার ওপর। তবে গুজরাত, মহারাষ্ট্রের চিত্রটা মোটেই ভালো নয়। গুজরাতে মজুরি ১০০ টাকা। মহারাষ্ট্রে কৃষিক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ১০০ থেকে ১২০ টাকা। কিন্তু, অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থাটা অবশ্য আরও খারাপ। মজুরি ৯০ টাকা ৬৫ পয়সা। কর্নাটকে কৃষিতে ১৩৩ টাকা ৮০ পয়সা হলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরি খুবই কম, মাত্র ৭২ টাকা ৯৪ পয়সা। কৃষিক্ষেত্রে এই মজুরি সবচেয়ে কম নাগাল্যান্ডে, মাত্র ৮০ টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম অসমে, মাত্র ৬৬ টাকা ৫০ পয়সা। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মনিযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

- একদিন ৩০.১১.১০

১ পাতার শেষাংশ..... তাসমিনারা খাতুন (১৩) সপ্তম শ্রেণির পর অর্থাভাবে স্কুলে যেতে পারেনি। দু'বছর ধরে তার পড়াশোনা বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া সাকিরুল হক (১১), উমেসালমা (৮), আসিয়া খাতুন (৫) ও জুলফিকার (২), এরা কী করে স্কুলের মুখ দেখবে কিংবা হাতে স্লেট পেন্সিল ধরবে। পেটের ভাতই তো জোটে না। তার উপর 'বাড়ির বোঝা' হয়ে রয়েছেন সত্তর বছরে বৃদ্ধা শাশুড়ি ফুলসুম বেওয়া। শাশুড়ি চোখে দেখতে পান না, শরীরে অপুষ্টিজনিত রোগ বাসা বেঁধেছে। পাঁচ সন্তানকে নিয়ে গ্রামের রাস্তায় বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন কার্যত 'বিধবা' সামিয়ারা বিবি। খদ্দের খুঁজছেন। দরও বেঁধে দিয়েছেন। ১৩ বছরের মেয়ের দাম মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। আট বছরের সাকিরুল ও দুই বছরের জুলফিকারের দাম নেবেন ১০ হাজার টাকা করে। আর ছোট দুই শিশুকন্যার দাম মাত্র তিন হাজার টাকা করে পেলেই স্বামীর অন্তত চিকিৎসা করাতে পারবেন তিনি।

ইংলিশবাজার শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে বরকলের ঘাট থেকে মহানন্দা নদী টপকে মিলবে শাহনগর গ্রামটি। অধিকাংশই দুঃস্থ, দিনমজুর। মঙ্গলবার সামিয়ারা বিবি চোখের জল ঝরিয়ে বলেন, ''কাউকেই খেতে দিতে পারছি না। কচুশাক কুড়িয়ে সিদ্ধ করে খেতে হয়। ছেলেমেয়েদের কষ্ট দেখতে পারছি না। স্বামী কানের অসুখে ভুগছিলেন। চাঁদা তুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। দু'বছর আগে পাগল হয়ে গিয়েছে। স্বামীকে বাঁচাতে হলে প্রতি মাসে দু'হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হবে। সেই কারণেই সন্তানদের বিক্রি করতে চাইছি।''

- সংবাদ প্রতিদিন ০৩.১১.১০

প্রাথমিক শিক্ষার একাল সেকাল

■ তপন কুমার দাস ■

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ।' মানবের ভিতর যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবন বিদ্যমান না থাকত, তাহলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনও জ্ঞানী ও শক্তিমান হতে পারত না। বহিঃ পদার্থ ও বাইরের উপায় সকল তার অন্তরে কোনপ্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবেশ করতে দিতে পারে না। কিন্তু যে সকল আবরণ তার ভিতরে জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সে সবকে দূর করতে মাত্র তাকে সহায়তা করতে পারে। ওই সকল আবরণ সকল দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত-সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়ে তাকে ক্রমে সর্বজ্ঞ এবং জগৎসৃষ্টি কর্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্ব প্রকার শক্তিতে ভূষিত করে তোলে। অতএব স্বামীজীর মতে ওইসব আবরণ সকল দূরীভূত করবার বিশিষ্ট উপায় সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করবার যোগ্য।

সেকালের প্রাথমিক শিক্ষা : ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলছিল বলেই শিক্ষাবিদ্রা মনে করেন। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। তখনও সেই প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়নি। তখনও দেশের সর্বত্র বহু টোল চতুস্পাঠী ছিল, মক্তব মাদ্রাসা ছিল; তখনও গ্রামে গ্রামে গুরুমশাই পাঠশালায় পড়াতেন। তখন টোল চতুস্পাঠী ছিল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'মক্তব' ছিল কোরান বা আরবি শেখানোর প্রাথমিক বিদ্যালয়। ধর্মান্তরিত বাঙালী সন্তানদের 'শিক্ষার জন্য' এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দরকার ছিল। এছাড়া ছিল কিছু ফারসী স্কুল। এই ধরনের স্কুলগুলিও মক্তব নামে পরিচিত ছিল। এই ধরনের স্কুলের একটা অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল। এছাড়া ছিল পাঠশালা। এটাই সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেকালের পাঠশালাগুলির ব্যবস্থা ছিল খুবই সাদাসিদে ধরনের। সকল পাঠশালারই যে নিজস্ব গৃহ ছিল তা নয়—অনেক ক্ষেত্রেই কোন সম্পন্ন গৃহস্থের চন্ডীমন্ডপে বা বারোয়ারীতলায় পূজা মন্ডপে পাঠশালা বসত। যেখানে নিদেনপক্ষে তাও জুটত না সেখানে গুরুমশাই গাছতলায় আশ্রয় নিতেন।

পাঠশালা শুরুর কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। গুরুমশায়ের সুবিধামত পাঠশালা বসত, ছুটি হত। গ্রাম্য উৎসবে, পূজাপার্বনে পাঠশালা বন্ধ থাকত। পাঠশালার পাঠ্য ছিল সংকীর্ণ, সামান্য লেখাপড়া ও জমা খরচের হিসাব। পাঠ্য বলতে এটুকুই ছিল। না ছিল ইতিহাস-ভূগোল, না ছিল বিজ্ঞান, না ছিল স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা হাতের কাজ বা শরীরচর্চা। বালকেরা চার পাঁচ বছর পাঠশালায় কাটিয়ে কোনমতে রামায়ন মহাভারত পড়তে, চিঠিটা পত্রটা লিখতে, দলিল দস্তাবেজ তৈরি করতে ও জমিদারি মহাজনী হিসাবটা রাখতে শিখলেই তাদের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হত। তখন কিন্তু ছাপা পুস্তকের চল হয়নি। পাঠশালায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই পড়ত এবং সাধারণত মধ্যবিত্ত বলতে আমরা যাদের বুঝি তাদের ছেলেরাই পড়াশুনো শিখতে যেত। লেখাপড়া শিখে তারা জমিদারি সেরেস্তা বা মহাজনের গদিতে মহুরীগিরি করতে। এই সময় মেয়েরা সাধারণত পাঠশালায় যেত না। তারা যেটুকু লেখাপড়া শিখত তা বাড়িতেই। তবে দু এক ক্ষেত্রে খুব অল্প বয়সে মেয়েরা পাঠশালায় গেলেও একটু বড় হলেই গৃহকর্মের শিক্ষায় নিয়োজিত হত। ফলে আর পাঠশালায় যাওয়া হতো না।

ইংরেজ আমল : এই সময়ে মিশনারীরাই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের সময় থেকেই এদেশে মিশনারীদের পদার্পন ঘটে। মিশনারীরা যেখানেই গেছেন সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে গেছেন-স্থানীয় ভাষাও শিখিয়েছেন। সেই ভাষায় বাইবেল বা অন্যান্য গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। খ্রীষ্টের বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাওবা বিদ্যালয় আগে স্থাপন করা হয়েছে পরে বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে; কোথাও বা ধর্মপ্রচার আগে করে পরে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

মিশনারিরা যে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলি দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলি থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। প্রথমত ওই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে খ্রীষ্টানধর্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। দ্বিতীয়ত সেখানে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি পড়ান হত। রবিবার ছুটি থাকত। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কিছু পার্থক্য ছিল। পাঠশালা বা টোলে একজন গুরুমশাই পড়াতেন কিন্তু মিশনারী স্কুলে একাধিক গুরু শেখাতেন। আর পুরাতন পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনও শ্রেণিবিভাগ ছিল না— কিন্তু নতুন ধরনের পাঠশালায় শ্রেণি বিভাগ প্রবর্তন হয়। পলাশীর রণাঙ্গনে ১৭৫৭ সালে স্বাধীনতা হারাবার পর ইংরেজের দ্রুত রাজ্যবিস্তার ঘটে কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর কোম্পানীর ছিল না। পাছে রাজ্য বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তখন কোম্পানীরাজ দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাত দিতে চাইত না।

১৭৭০ সাল নাগাদ কলকাতায় বাংলার শিক্ষা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। গড়ে ওঠে 'ক্যালকাটা ফ্রি স্কুল সোসাইটি'। কলকাতায় ইংরেজ কর্মচারির সন্তানদের জন্য গড়ে তোলা হয় এই প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংলায় এই প্রথম বিদ্যালয়। পাঠশালায় পরিবর্তে স্কুল।

১৭৯২ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর গ্রান্ট সাহেব জোর দিয়ে বলেন ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব মিশনারী বা অনুরূপ কোনও স্বেচ্ছাসেবীর হাতে না দিয়ে সরকারকেই নিতে হবে। তাঁর রিপোর্ট গ্রান্ট কমিশনের রিপোর্ট নামে পরিচিতি। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটি অনুমোদন করা হলেও হাউস অব লর্ডস এটা নাকচ করে। সদস্যদের কারও কারও যুক্তি ছিল লেখাপড়া শেখানোর জন্য আমেরিকা হাতছাড়া হয়েছে, সুতরাং ভারতের লোককে খরচ খরচা করে লেখাপড়া শেখানোর দরকার নেই। ১৭৯৯ সালে উইলিয়ম কেরী বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এসে কোম্পানীর মুলুক ছেড়ে শ্রীরামপুরের দিনেমারদের কাছে আশ্রয় নেন। আবার কোম্পানীর তৎকালীন বড় কর্মচারি ওয়ারেন হেস্টিংস সদ্য রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখাতে তাদের কিছু লোককে চাকরি দিয়ে খুশি করার জন্য ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপে কাশিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয় জীবনে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনি পাশ্চত্যের ও প্রাচ্যের মিলনে এক নিমেষে ভারতবর্ষকে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগে টেনে আনেন। এর সঙ্গে মানবসেবার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ডেভিড হেয়ার এদেশে আসেন এবং কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ ও ১৮২০ সালে বিশপ্‌স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোটদের শিক্ষার জন্য মিশনারীগণ ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায় প্রমুখ নতুন ধরনের পাঠশালা স্থাপন করেন। এই সময়ই (১৯১৯ সালে) কলকাতায় স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শেখানও শুরু হয়। রেভাঃ রবার্ট মে চুঁচুড়ায় ১৬টি স্কুল এবং শ্রীরামপুরে মিশনারীরা ২০টি স্কুল চালু করেন। ছাপাখানা স্থাপিত হয়ে পাঠ্যবই ছাপা হতে লাগল। 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'কে সরকার অনুমোদন করলে তারা পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করার সঙ্গে শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে।

১৮৩৫ সালে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক মিঃ অ্যাডামকে স্পেশাল কমিশনারের পদ দিয়ে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার একটি সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেন। এই সময়েই প্রতি জেলায় সরকারি জিলা স্কুল গড়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষার উৎসাহে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার মত হয়। শিক্ষার্থীরা বাংলা বর্ণমালা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি বর্ণমালারও পাঠ নিতে থাকে।

১৮৫৫ সালে ভারতের শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়ে জানার জন্য চালর্স উডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। একবছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে উড সাহেব কোম্পানীর নিকট ১০০টি অনুচ্ছেদের একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই প্রতিবেদনটিই 'উডস ডেসপ্যাচ' নামে পরিচিত। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত গর্ভমেন্ট শিক্ষানীতি পুর্নগঠন করেন। উডের ডেসপ্যাচই এদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হল বটে কিন্তু কাজের কাজ বিশেষ হয়নি। এই সময় আবার বাংলায় বিদ্যাসাগর 'মডেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন পাঠশালা ব্যবস্থাকে সংস্কার ও প্রাণবান করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে থাকেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ঠিকমত হল না। না হওয়ার কারণগুলির মধ্যে ভারত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার ও জনশিক্ষার প্রতি দরদের ও শ্রদ্ধার অভাব অন্যতম কারণ। প্রাথমিক শিক্ষার অপেক্ষা উচ্চশিক্ষার প্রতি কোম্পানীর প্রচেষ্টা ছিল অনেক বেশি।

১৮৭৮ সালে দেশের অবসরপ্রাপ্ত একজন পাদরি বিলেতে ফিরে গিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন নাম দেন 'জেনারেল কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া'। তাঁরা বড়লাট রিপনকে এক ডেপুটেশন দিয়ে বলেন—ভারতের নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। রিপন ১৮৮২ সালে স্যার ডব্লিউ হান্টারকে সভাপতি করে কয়েকজন দেশি-বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তি, পাদরিদের নিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই 'হান্টার কমিশন' ৩৬টি সুপারিশ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প এক ভারতীয় শিক্ষার প্রথম উন্মেষ ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে। তাঁর শিশুমনের ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব খুব একটি অনুকূল ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজের স্কুলে পড়ে বাঙালি শিশু 'মানুষ' হচ্ছে না——দাস হচ্ছে। তারা শিখছে কেবল মুখস্থ করতে ও নকল করতে। ১৯০১ সালে শুরু হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের স্কুল। ইংরেজের স্কুল সম্পর্কে তিনি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন——'স্কুল বলতে আমরা যা বুঝি যে একটা শিক্ষা দেবার কল। মাষ্টার এ কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজিয়ে কারখানা খোলে। কল চলতে আরম্ভ হয়—মাস্টারের মুখও চলতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয় —মাস্টারের কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্ররা দু-চার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যে নিয়ে বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হয়ে তার উপর মার্কস পড়ে।

বলা বাহুল্য এই যান্ত্রিক স্কুল শিক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন শিশুদের। তাঁর মতে শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁর ব্যবসা।

১৯০৪ সালে কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। তাতে তিনি এদেশের শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান ক্রটিগুলি বিশ্লেষণ করে সেগুলি দূর করার উপায় নির্দেশ করেন। মাতৃভাষার অবজ্ঞা, পরীক্ষার প্রাধান্য ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বলেন। কিন্তু এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর শিক্ষা সংস্কারকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইন দেশজুড়ে ক্ষোভের সঞ্চার করলে তাঁর শিক্ষানীতি ফলপ্রসু হয়নি।

১৯০৫ সাল বাংলার রাজনীতি ও বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা দুটি পক্ষেরই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক বছর। ইংরেজ শাসনের ১৫০ বছর পূর্ণ হলেও এ পর্যন্ত শুরু করে ১০টির বেশি শিক্ষা কমিশন নানা সংস্কারের সুপারিশ করেছে। কিন্তু কাজের কাজ খুব একটা হয়নি।

এরপর শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন। এই আন্দোলনের সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিকার ছিল প্রাথমিক ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। গর্ভমন্ট মুখে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও কার্যত কিছুই করছিলেন না। এই সময় (১৯১১) মহামতী গোখেলে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিল উপস্থাপিত করেন। এই বিলের মুখ্য বিষয় কোনো প্রাদেশিক গর্ভমেন্ট যদি মনে করেন

কোনো বিশেষ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে।

১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এলেন। দেশের কল্যাণ কামনা করে তিনি শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেন। এই উপলক্ষে ও সুযোগে ভারত গর্ভমেন্ট আর একবার তাঁদের শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা বলেন (যদিও গোখলের বিলের বিরোধীতা করেছেন) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার চান। সুতরাং এখন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তারা অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করেন।

১৯১৯ সালে পাশ হয় নতুন 'গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'। এর মধ্যে প্রাদেশিক সরকারগুলো আইন পাশ করে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দিতে থাকলেন। এ বছরই (১৯১৯) সালে 'বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট' পাশ হয়। ১৯২০ সালে বাংলা সরকার মিঃ ই.ই.বিস-কে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। মিঃ বিস প্রথম রিপোর্ট দেন ১৯২১ সালে এবং দ্বিতীয়টি দেন ১৯২২ সালে। ১৯২১ সালে যখন গ্রামগুলিকে নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় তখন সেগুলিতে যাতে উনিশ সালের আইন প্রয়োগ করা যায় তার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ঠিকমত আইন হতে আরও কয়েক বছর কেটে যায়। অবশেষে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলি মোটামুটি প্রায় একইরকম। ওই আইনে প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য নতুন ধরনের এক কাউন্সিল বা বোর্ড গঠন করার ব্যবস্থা থাকবে। ওই বোর্ডগুলি নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন ঠিক করবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য বোর্ডগুলি শিক্ষা কর ধার্য করতে পারবেন। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সে ব্যবস্থা বোর্ডের ইচ্ছামত বৈতনিক বা অবৈতনিক হবে।

নতুন আইনে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য গর্ভমেন্টকে দেয় খাজনার প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা শিক্ষা কর ধার্য করার ব্যবস্থা হল। এই শিক্ষা-কর হতে যা আয় হবে বাংলা গর্ভমেন্ট তার উপর আরও ২৩ লক্ষ টাকা দেবেন বলে স্থির হল। এতদিন জেলা বোর্ডের উপরই প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল; এখন নতুন আইনে তার জায়গায় জেলা স্কুলবোর্ড গঠন করে তার উপর সে ভার দেওয়া হল। জেলা স্কুল বোর্ড শিক্ষা করের টাকা পাবে, সরকারি সাহায্যের অংশ পাবে এবং এই টাকায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা—এ সকল ব্যাপারই জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে থাকবে। ১৯৩০ সালের আইনে মুখবন্ধে বলা হয়েছিল দশ বছরের মধ্যে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা যাবে।

ইংরেজের ভারত শাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা স্বভাবতই প্রশাসকদের যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্নও তুলে দিয়ে থাকবে। ১৯৩৫ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে বিজ্ঞাপিত ভারতের শিক্ষামন্ত্রক প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষা প্রস্তাব অত্যন্ত সুচিন্তিত বলে গণ্য করা হয়। ওই প্রস্তাবগুলিতে ৩২টি প্রধান সূত্র উল্লিখিত ছিল।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতি : জাতীয় বুনিয়াদি প্রকল্পই ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্প হিসাবে পরিচিত। এই প্রকল্পের উদ্ভাবক মহাত্মা গান্ধী। ১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সংখ্যাগুলোতে এ বিষয়ে তিনি একটা রূপরেখা রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর অনুপ্রেরণায় বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হয়। ওই শিক্ষা ব্যবস্থায় সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সাত বছরের আবশ্যিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে সাত বছরের কমে কোনোমতে হয়ত লেখা ও পড়া শেখান অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত করা চলে না। বিশেষ করে কতকগুলি অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় আছে যেগুলি খুব ছোট বয়সে শেখান যায় না।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় পাঠ্যক্রমেরও প্রকৃতিগত হেরফের করা হয়েছে। তাতে নানা রকমের হাতে কলমে কাজের ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি শেখাবার ব্যবস্থা আছে। এর সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী এবং মাতৃভাষাকে আগাগোড়া শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার। গান্ধীজী মনে করেন মাতৃভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার করে এবং শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার করে আমরা সাত বছরে যে জ্ঞান ছাত্রদের দিতে পারব তা বর্তমানে ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে যা শেখে তার তুলনায় কম হবে না, বরং কোনও কোনও বিষয়ে হয়ত বেশিই হবে। ১৯৪৫ সালে গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার এই ত্রুটি দূর করবার জন্য 'নয় তালিম' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। নয়ী তালিম বুনিয়াদি তালিমেরই সম্প্রসারণ মাত্র। উভয়ের মূল নীতি এক। বস্তুত বুনিয়াদি তালিম নয়ী তালিমের একটি স্তর মাত্র। নয়ী তালিমে চার স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে-১) পূর্ব বুনিয়াদি শিক্ষা, ২) বুনিয়াদি শিক্ষা, ৩) উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা, ৪) বয়স্ক শিক্ষা। প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষার মূল প্রকৃতি একইরকম অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক হবে, পূর্ব বুনিয়াদি স্তরে অবশ্য খেলাকে এই কর্মের অঙ্গীভূত করা হবে কারণ শিশুর কাছে খেলা ও কাজের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। এই স্তরে তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উত্তর বুনিয়াদি উচ্চ শিক্ষার স্তর, এই শিক্ষা মুখ্যত বৃত্তিমূলক হবে। ৭ বছরের বুনিয়াদি পাঠ্যক্রমে যে যে বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সেগুলি হল- (১) মূল শিল্প বা বুনিয়াদি শিল্প (যেমন কাঠের কাজ, সুতোকাটা/বয়ন, কৃষি ও ফুল ও ফলের বাগানের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি। (২) মাতৃভাষা (শিশু যাতে ঠিকমত কথা বলতে, লিখতে, পড়তে পারে, বাঞ্ছিত গতিতে ঠিক লিখতে পারে), (৩) গণিত (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক, সুদকষা, পরিমাপ, জ্যামিতিক প্রয়োগ ইত্যাদি), (৪) সমাজবিদ্যা (দেশের ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান, নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার ইত্যাদি, (৫) সাধারণ বিজ্ঞান (প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারনা অর্জন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের অভ্যাস গঠন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি), (৬) অঙ্কন (আকার ও রং পর্যবেক্ষন, স্মৃতি থেকে আকারের ধারণা, রুচি সম্মত ও নকশা অঙ্কন ইত্যাদি), (৭) সঙ্গীত (শিশুর স্বাভাবিক সুর ও ছন্দবোধের ঠিকানা, উদ্দীপনামূলক গান, দলগত গান, কোরাস ইত্যাদি), (৮) হিন্দুস্থানি (এটি অবশ্য শিক্ষনীয় হবে। ভবিষ্যতে সারা দেশের যোগাযোগের ভাষার সামর্থ্য অর্জন হবে এর উদ্দেশ্য)

বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে নানা বিতর্ক ও প্রশ্ন হয়েছে। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জবাব দিয়েছিলেন মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী) সি. জে. ভার্কি ১৯৩৯ সালে। তিনি বলেন— বর্তমান শিক্ষা পুস্তক নির্ভর, কিন্তু ওয়ার্ধা প্রকল্প হচ্ছে শিক্ষককেন্দ্রিক, শিশুকেন্দ্রিক ও শিল্পকাজ কেন্দ্রিক। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস তাঁদের কংগ্রেস শাসিত রাজ্যসমূহে ওয়ার্ধা শিল্প প্রকল্প মঞ্জুর করেন। এই সময় ভারত সরকারের সেন্ট্রাল এডভাইজারি শিক্ষা বোর্ড ওয়ার্ধা স্কীম পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। পরে ১৯৪২ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতায় এই শিক্ষা প্রকল্প চাপা পড়ে যায়।

স্বাধীনতার উত্তর পর্বের প্রাথমিক শিক্ষা : ১৯৪৪ সালে ইংরেজ সরকারের শিক্ষাবিভাগ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালে এসে তার পুরো ছকটাই ভেস্তে গেল। ওলোট-পালোট হয়ে গেল সব পরিসংখ্যান। সারা বাংলা জুড়ে শুরু হলো অশান্তি-অস্বস্তি। ঠিকানা বদলের জেরে জেরবার হল বাঙালি। ফলে ওই আঘাতে সবচেয়ে আহত হল বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা। ভারত অতঃপর এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান পায়। স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বও নিশ্চয় মহামতি গোখলের মতো বুঝেছিলেন যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নই এদেশের সব থেকে বড় প্রশ্ন। তাই সংবিধানে পরিষ্কার লেখা হল ১০ বছরের মধ্যে ভারতের স্কুল পড়ুয়া সব শিশুর জন্য বিনা বেতনে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারিভাবে স্বাধীন হবার পরেও প্রশাসনিক পরিকাঠামোটা মূলত প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের অবস্থাতেই রয়ে গেল। শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই। সঙ্গে চলল দশবছর অন্তর শিক্ষা সমীক্ষা। সেইমত ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬১ সালের সমীক্ষা প্রকাশিত হল ১৯৬১ সালে। সমীক্ষা প্রকাশ করলেন NCERT। এই সমীক্ষাকে বলা হয় স্বাধীন ভারতে First Year Book of Education Review। ওই সমীক্ষায় পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে যেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৩৫% সেখানে ১৯৬০-৬১ সালে পড়ুয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১%। তৎকালীন NCERT ডিরেক্টর প্রেম কৃপাল উল্লেখ করেন স্বাধীনতার ১৪ বছর পরেও ৪০% শিশু বাইরে থেকে যাচ্ছে। দেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ২.২% শিক্ষায় ব্যয় হয় ভারতে। অন্যান্য দেশে এর দ্বিগুণ। ওই বইয়ে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ ছিল তার মধ্যে মূলত দুটি দিক ছিল—(১) ৬-১৪ বয়সের সব ছেলেমেয়ের বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য রাজ্য সরকারকে সহায়তা দান, (২) প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নতি; কালক্রমে যাতে সবরকম স্কুল বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আইন :

সরকার প্রথম একটি প্রাথমিক শিক্ষা আইন করেন। আইনের প্রধানসূত্রগুলো ছিল :

ক) একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হবে। বোর্ডের সাংগঠনিক আকার, তহবিল, পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি খুঁটিনাটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়।

খ) প্রতি জেলায়, কলকাতায়, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল গঠন করা হবে। সেগুলির পরিচালনায় বিধি-নিয়মও বলে দেওয়া হল।

গ) প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

ঘ) একটি ধারায় বলা হয় রাজ্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো পড়ুয়ার কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না ।

ঙ) ১৯৩০ সালের Bengali (Rural) Primary Education Act অনুসারে যেসব এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা করা হয়েছিল সে সব এলাকায় পড়ুয়াদের কাছ থেকেও বেতন নেওয়া হবে না ।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠন হয়। এই সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা পর্যালোচনা করার জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করা ও সেই সকল কমিশনের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম তৈরি ও চালু হয়েছিল। দীর্ঘ চব্বিশ বছর চলার পর তাকে যুগোপযোগী করে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে সরকারি নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায় তৈরি হয় প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি (সরকারি আদেশনামা নং ১৪৩৫ -ইডিএনপি) তাং ২০.৯.১৯৭৪)। তিন বছরে চারবার সম্প্রসারিত হয়ে ওই কমিটি প্রকৃতপক্ষে কাজ শুরু করে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর। ওই দু বছরের ঐকান্তিক চেষ্টায় কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার যে পাঠ্যসূচি গ্রহণ করে পরবর্তীকালে তা বহুবির্তর্কের সৃষ্টি করে। যেমন -(১) ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষা থাকবে না, (২) No detention, (৩) বার্ষিক পরীক্ষার বিদায়।

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রচলন হয়। এই শিক্ষানীতির ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ, উৎপাদনাত্মক-সৃজনাত্মক কাজ ও খেলাধূলার শরীরচর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে (১) অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (পাঠদানে ন্যূনতম প্রয়োজন ব্ল্যাকবোর্ডের অভাব দূর করার সঙ্গে ঘরবাড়ি মেরামত, স্কুল লাইব্রেরি, কিছু পাঠ উপকরণ প্রভৃতি যোগান), (২) এম.এল.সি (মিনিমাম লারনিং কনটিনয়াম) অর্থাৎ কোনও শ্রেণির ন্যূনতম শিখন সামর্থ অর্জিত হলে পড়ুয়া পরবর্তী শ্রেণিতে যাবার যোগ্য ধরে নিতে হবে), (৩) এম এল এল (মিনিমাম লারনিং লেভেল) অর্থাৎ এম এল সি ধারণাকে আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্যেই এম এল এল ধারণা, ন্যূনতম শিক্ষাদান নির্ধারিত হল শ্রেণিভিত্তিক, (৪) আনন্দ পাঠ—সব শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা, তাদের স্কুলে উপস্থিত সুনিশ্চিত করা, সবাইকে ধরে রাখা— এই তিনটি লক্ষ্য পূরণে আনন্দ পাঠ ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করা হয়। ৫) ডিপিইপি (ডিষ্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম) অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ডিএফআইডি'র সহায়তায় ১৯৯৭ সালে রাজ্য কয়েকটি জেলায় এই প্রকল্প চালু হয়।

শেষাংশ ৮ পাতায়

সংবাদ সংকলন : মালদহের চরবাসীদের নাগরিকত্ব লাভ

মালদহে চরের বাসিন্দাদের নামও ভোটার তালিকায় তোলা হবে, নির্দেশ কমিশনের

সুব্রত ধর • মালদহ

বি এন এ : দীর্ঘ টালবাহানার পর মালদহে হামিদপুর চরের বাসিন্দাদের নাম আবার ভোটার তালিকায় তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই কাজে হাত দিয়েছে জেলা প্রশাসন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পাঁচ দিন আগে এনিয়ে গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা চরটির বাসিন্দারা রীতিমতো বিস্মিত। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) তরুণ সিংহরায় বলেন, ভোটার তালিকায় চরবাসীদের নাম তোলা হবে। এজন্য একটি সমীক্ষক দলও তৈরি করা হয়েছে। দলটির রিপোর্ট পাওয়ার পর জেলা নির্বাচন আধিকারিক বিশেষ ক্ষমতাবলে তাঁদের নাম তালিকায় তুলতে পারবেন। গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা চরটির বাসিন্দাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার দাবি দীর্ঘদিনের। এক বছরের মধ্যে জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা একাধিকবার চরটিতে গিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই বিষয়ে কয়েকবার নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেকর্ডে চরটি 'শিকস্তি' দেখানোয় সেখানকার বাসিন্দাদের নাম এতদিনেও ভোটার তালিকায় ওঠেনি। এই অজুহাতে এবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন চরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। গত ৯-৩০ জুলাই পর্যন্ত আবেদন গ্রহণের কাজ চলে। এখন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পাঁচ দিন আগে প্রশাসন চরটির বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার প্রক্রিয়া শুরু করায় গুঞ্জন উঠেছে।

ভাঙনের জেরে প্রায় ২০ বছর আগে কালিয়াচক-২ ব্লকে গঙ্গার বুকে চরটি গজিয়ে ওঠে। বাসিন্দারা বলেন, গঙ্গার ভাঙনে হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যার ফলে এখানকার বাসিন্দারাও নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। ২০ বছর ধরে চরটিতে বসবাস করলেও প্রশাসন ভোটার তালিকায় নাম তোলেনি। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর জেলার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হব। তার আগে কীভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া শেষ হবে তা বুঝতে পারছি না। এর থেকেই মনে হচ্ছে বিষয়টি ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। তবে ভোটার তালিকায় নাম উঠলে ভীষণ উপকৃত হব। ভোটার তালিকায় নাম তোলার দাবি পূরণ হলে নিজভূমে পরবাসী হয়ে কাটাতে হবে না। এই কাজে প্রশাসনকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করা হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, চরবাসীদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার জন্য ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছে চরটির মৌজা, জি এল নম্বর ও সেটি কোন থানা এলাকায় পড়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

ভূমি সংস্কার দপ্তর সমীক্ষা করতে শীঘ্রই চরটিতে যাবে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই চরবাসীদের নাম তালিকায় তোলা হবে। ভোটার তালিকা প্রকাশের পরও নির্বাচন আধিকারিক এই কাজ করতে পারেন। এনিয়ে কোনও সমস্যা নেই। — বর্তমান ২৩.০৯.১০

প্রায় এক যুগ পর মালদহে

ভাঙনে উদ্বাস্তু হামিদপুর চরের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ

বি এন এ, মালদহ : প্রায় এক যুগ পর মালদহে হামিদপুর চরের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চরবাসীদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার শুনানি হবে। চরটির কবজা করতে সি পি এম মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেখানে ঘন ঘন গিয়ে দলের নেতারা চরবাসীদের মন ভেজানোর চেষ্টা করছে। জেলার রাজনীতিতে এ নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন উঠেছে।

প্রায় ৩০ বছর আগে কালিয়াচক - ২ ব্লকের গঙ্গা বক্ষে চরটি জেগে ওঠে। চরটি প্রায় ২১ বর্গ কিলোমিটার চওড়া। আনুমানিক ৯০-এর দশক থেকে এখানে গঙ্গার ভাঙনে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি বসবাস শুরু করে। এদের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাওয়া হামিদপুর ও কে বি ঝাইবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। নদী ভাঙনের জেরে বসত ভিটা ও চাষের জমির পাশাপাশি এঁরা নাগরিকত্বও হারিয়ে ফেলেছেন। দীর্ঘ আন্দোলনের পর এবার তাঁদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, ইতিমধ্যে চরবাসীদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদনপত্র নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ৩ ডিসেম্বর এখানে ভোটার তালিকায় নাম তোলার শুনানি হবে। এই দিন চরে অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) তরুণ সিংহরায়, জেলা নির্বাচন আধিকারিক শঙ্খ সাঁতরা প্রমুখ হাজির থাকবেন। ভোটার তালিকা তৈরির কাজ শেষ হলে চরটিকে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

চরটি দখলে নিতে সি পি এম তৎপর হয়ে উঠেছে। সি পি এম বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ দলের কর্মীদের নিয়ে সেখানে গিয়ে মাঝেমধ্যেই মিটিং করছেন।

জেলার রাজনীতিতে এনিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। চরবাসীরা বলেন, এখানে ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো প্রায় ১৫০০ লোক আছেন। ১২ বছর আগে আমাদের ভোটাধিকার ছিল।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহু লড়াই আন্দোলন করে আবার ভোটাধিকার ফিরে পাচ্ছি। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলি নির্বিকার থাকায় এই সমস্যা মিটতে এতদিন সময় লাগছে। এখন সি পি এম নেতারা এখানকার মাটিতে ঘন ঘন পা রাখছেন। তাঁদের জন্য আমাদের দাবি পূরণ হচ্ছে বলে এলাকায় প্রচার করে তাঁরা বাসিন্দাদের মন পেতে চেষ্টা করছেন। তবে, নাগরিকত্ব ফিরে পেলে সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করেই ভোট দেব। সি পি এমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা বিধায়ক বিশ্বনাথবাবু অবশ্য দাবি করেন চরবাসীদের এই সমস্যা নিয়ে একাধিকবার বিধানসভায় সরব হয়েছি।

বাসিন্দাদের নিয়ে সি পি এমের আন্দোলনের ফলেই সমস্যাটি মিটতে চলেছে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) বলেন, এতদিন চরটি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মানচিত্রে পয়স্তি বলে উল্লেখ ছিল না। তাই এখানকার বাসিন্দাদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে এতদিন সময় লেগেছে। তবে, চরটিকে এবার কালিয়াচক-২ ব্লকের হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এখানকার বুথ নম্বর ৮৫। বুথটির নামকরণ করা হয়েছে শ্রীপুর শ্রীহরিটোলা। মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে এলাকাটি যুক্ত করা হচ্ছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র থাকলে বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে। — বর্তমান ২২.১১.১০

হামিদপুর চরে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান শুরু

মোথাবাড়ি, ২ ডিসেম্বর : দীর্ঘ আন্দোলনের পর বৃহস্পতিবার থেকে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান শুরু হল হামিদপুর চরে। বাঙ্গীটোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে স্বাস্থ্যকর্মীরা এদিন থেকে রেগুলার ইমুনাইজেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু করলেন। উল্লেখ্য, গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি দীর্ঘদিন ধরে চরবাসীদের স্বার্থে আন্দোলন করে আসছে। গঙ্গার বুকে গজিয়ে ওঠা চরের বেশিরভাগই ঝাড়খণ্ডের দখলে চলে গেছে। চরের প্রায় হাজার চারেক বাসিন্দার এবার ভোটার তালিকায় নাম উঠতে চলেছে। তার আগেই স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া। চরবাসী রতন মণ্ডল, কার্তিক মণ্ডল প্রমুখরা জানান, তাঁদের দাবি সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এতদিনে। গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির নেতা সঞ্জয় বসাক জানান, আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সুফল অবশেষে মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাকলি বসাক নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। — উত্তরবঙ্গ সংবাদ ০৩.১২.১০

হামিদপুর চরে এই প্রথম ভোটার হওয়ার শুনানী

তৃপ্তি সান্ত্রা

৩ ডিসেম্বর : ঝুকে পড়ে কিংকুরি মণ্ডল আর নিশীথ মণ্ডলের নাম দেখতে দেখতে অঘ্রানের শেষ সকালে চঞ্চল হয়ে উঠছি। যাক বাবা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন, সতন্ত্র রাষ্ট্র চেয়ে টেঁয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হল না চরুয়াদের। স্থান চর হামিদপুর। তারিখ ৩ ডিসেম্বর ২০১০। শুনানী চলছে, আশা করা যায় সামনের নির্বাচনে ভোটার লিস্টে যাদের নাম উঠছে তারা ভোট দিতে পারবেন।

ভোট দিলে কী হয় ? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হয়। তারপর কী হয়, কল্যাণময় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য কী করেন, কেন কোনো কোনো অঞ্চলের লোকজন নির্বাচন বয়কট করতে চান, কেউ কেউ রাজ্য থেকে বেরিয়ে অন্য রাজ্যের দাবী করেন এসব অনেক গুঢ় আলোচনা। কিন্তু চরের যে লক্ষাধিক মানুষ না পশ্চিমবঙ্গ না ঝাড়খণ্ডের হয়ে স্থানাঙ্ক হয়ে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন, কোনভাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছেন না, তাদের কাছে এই শুনানী গুরুত্বপূর্ণ। ডগডগে সিঁদুরের

ক্যামোফ্লেজ ঢেকে রাখে যাবতীয় অভাব অনটন বঞ্চনা। ভাত-কাপড় কতটা জুটবে জানা নেই, তবু স্বীকৃত সিঁদুরটুকুর মায়া। জগু মণ্ডল যেমন বলেন, ভোট অনেক কিছু দিবে, ভোটার না হলে তো কিছু দিবে না। সন্ধ্যা মণ্ডল বলেন, শক্তিই নাই তো কি হবে। তারা শক্তি চান। ভোট দিতে চান। ভোট মানে নাগরিক স্বীকৃতি, তুমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অধিবাসী তথা ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। দীর্ঘদিন চলছে তাদের লড়াই। আজকের শুনানী গঙ্গা ভাঙনের স্থানাঙ্ক হারানো মানুষদের আংশিক জয়। জয় গঙ্গা ভাঙণ প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির। কেদার মণ্ডল, খিদির বক্স, সঞ্জয় বসাক, রহুল আমিনের সঙ্গে পুরনো হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য মানুষ।

পরিচয়পত্র, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড না থাকার জন্য তারা বাইরে কাজ করতে গিয়ে প্রতিপদে অপদস্থ হন। বাংলাদেশি বলে ধরা পড়েন, চোর অপবাদ নিয়ে মুখ কালো করে পালিয়ে আসেন। হামিদপুর চরের সব মানুষ তাই খুশি। এই চরে মানুষ বাস করছেন ছয় সাত বছর ধরে। পরিবার রয়েছে ৪১২টি। হিয়ারিং বা শুনানির জন্য আবেদন করেছেন ৯০৭ জন। এসেছেন ৬০ শতাংশ।

সবাই আসেননি কেন? মঙ্গলপুরার শৈলেন মণ্ডল বিহার নেপাল সীমান্তে ধান কাটতে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'এখন তো সবাই ধান কাটতে গেছে। একমাস পরে হলে ভালো হত। আসলাম তো খরচ পড়ল তিনশো টাকা। আবার বলে আসতে হবে - পরব না।'

শুনানির দিন ধার্য করেছেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। সুতরাং যাঁরা এসেছেন তাঁদের কিছু করার নেই। যে চল্লিশ শতাংশ আসেননি তারা সবাই পুরুষ নন। পুরুষরা নয় বাইরে গেছেন। মেয়েরা?

টেবিল চেয়ারে ৯-১০ জন সরকারি অফিসার কর্মী শুনানির কাজে কাগজপত্র দেখতে ব্যস্ত। এর মাঝে কারো গলা - 'কুনঠে গেলি। সীমা - সীমা ডেকে হ্যালাকান।'

কেউ বলেন - 'হামার ইস্ত্রিরিটার হল না।' এডিএম তরুণ সিংহ রায় চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বলেন - 'ফাইল বন্ধ করে দিলাম। অন্য জায়গায় বিডিও অফিসে যেতে হবে-'

খুব তো বেলা হয়নি, বিকেল চারটা অবধি তো শুনানি চলতে পারে। কেউ কী গ্রাম্য ভাষায় এমন কিছু বিড়বিড় করেন নিজের মনে আর একটু সময় দেওয়া যেত না? ধান কাটার জন্য আরো কিছু পরে।

৫ তারিখ ফাইনাল লিস্ট বেরোবে, গুটোতে হবে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে - আমাদের কিছু করার নেই' - অসহায় তরুণ সিংহ রায় জানালেন।

ভোটার লিস্টে নাম তোলা নিয়ে আরো একটি সমস্যার কথা শোনা গেল। এতদিন ধরে, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভাঙছে পঞ্চানন্দপুর। পশ্চিমবঙ্গের জমি ঝাড়খণ্ড ভুখণ্ডে পড়েছে - পশ্চিমবঙ্গ কোনো পরিষেবা দেয়নি চরের মানুষদের। রাজ্যের সীমা নিয়েও কোনো দাবি তোলেনি। ভাঙনপীড়িত মানুষ কেউ কেউ সুযোগ সুবিধার আশায় কোনোভাবে ঝাড়খণ্ড সরকারের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পেরেছেন। দেখা যাচ্ছে, হয়তো বাবা-মা নাম তুলেছেন, ছেলে চাইছেন না তুলতে। সে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে চায়। বাংলাভাষী মানুষ যারা নদী ভাঙনে চরে আছেন তারা কখনো ঝাড়খণ্ডী পরিচিতি চান না, কিন্তু বাধ্য হয়ে হতে হচ্ছে। অন্যখানে কামতাপুর বা গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন সরকার সমর্থন করছেন না। এখানে রাষ্ট্রের, রাজ্যের অবহেলায় মানুষ পুরোনো পরিচয় হারাচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। ৭০ শতাংশ চাঁইমণ্ডল, ৩০ শতাংশ মুসলমান মিলেমিশে থাকেন। সাইনা খাতুনের শুনাানি ফর্মে চা পড়ে গেল, শুকোতে নিয়ে যান সমর ঘোষ। গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাইমারি স্কুল কিছু নেই। দুটো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির তৈরি করা এনজিও'র সহযোগিতায়। অস্থায়ী শিক্ষক সমর ঘোষ স্বপ্ন দেখেন - ভোট হলে প্রাইমারি স্কুল হবে। পড়বে গ্রামের ছেলে মেয়েরা। সন্ধ্যা,সীমা, সাইনা ভাবে অসুখ হলে আর মালদায় যেতে হবে না। এখানে তো কোনো ব্যবস্থা নাই। হাসপাতালের যোগাযোগটা চাই। এর মাঝে ৭৫ বছরের পার্বতী মণ্ডল বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন - ভাত্তা হয়নি, ভাত্তা হবে তো ভাত্তা? তোবড়ানো গাল, কোটরে চোখ, অসংখ্য বলি রেখা নিয়ে প্রাচীন শস্যশ্যামলা এক ভুখণ্ড যেভাবে ভুবয়ানের হাটে নিতান্ত অবহেলার ব্রাত্য। পার্বতীর দমফুলা ব্যারাম - ভাত্তা অর্থাৎ বার্ধক্যভাতাটা তাঁর কাছে খুব জরুরি।

এই সব খণ্ড খণ্ড আশা নিয়ে নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম দফাতেই চর হামিদপুর উত্তাল। বোতাম টেপার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিকভাবে শেষ হবে চরের মানুষদের ত্রিশঙ্কু অবস্থা - নতুন বছরে এই প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রইলাম তাঁদের সঙ্গে আমরা সবাই।

– উত্তরবঙ্গ সংবাদ ০৪.১২.২০১০

মিলবে 'পরিচয়', উৎসব হামিদপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শনিবার যেন উৎসব ছিল হামিদপুরে। নদীর চরের বাসিন্দাদের মনে ডেকেছিল ফুর্তির বান। আর হবে না? এতদিনে যে এই 'উদ্বাস্তু' মানুষগুলোর নাম পরিচয় ভোটার তালিকায় তোলার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মালদা জেলা প্রশাসন। এই প্রথম নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লগ্ন। আর তা ঘিরে 'উত্তেজনা'র সৃষ্টি হবে না? তাই তো আনন্দে বিহার-নেপাল থেকে কাজ ছেড়ে দলে দলে পা রেখেছেন নিজের ভিটেয়। এ 'সুযোগ' একবার এসেছে, আর যদি না-আসে?

শনিবার ছিল নদীর চরের সম্ভাব্য ভোটারদের শুনানি। স্কুলের তো আর বালাই নেই। তাই চরের মাঝেই বাঁশঝোপের ছায়ায় সকাল ১০টা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কাজ। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুণ সিংহ রায়, কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌরভ বারিক-সহ ১২ জন সরকারি আধিকারিক। আর তাঁদের সামনে একবুক আশা নিয়ে হাজির প্রায় কয়েকশো চরবাসী। সকলের হয়তো ভোটার তালিকায় নাম তোলার বয়সও হয়নি। তবু তারা এসেছে। এটা তো তখন আর কোনও সরকারি কর্মসূচি নয়, যেন উৎসব। আর বয়সের তোয়াক্কা না-করে তাতেই সামিল হয়েছেন সবাই। শুধু নাবালকরাই বা কেন, বয়সের ভারে হাঁটতে কষ্ট হলেও, আগ্রহ কম ছিল না ৭৫ বছরের বৃদ্ধা পাবর্তী মণ্ডল বা ৬৭ বছরের হেমা মণ্ডলের। সবার যে ভোট দেওয়ার বিরাট উৎসাহ রয়েছে, তা নয়। ভোটার কার্ড হলে বার্ধক্যভাতাটুকু তো মিলবে, সেই আশাতেই এসেছিলেন বৃদ্ধা সন্ধ্যা দাসী। আশির দশকের শেষে গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম। হামিদপুর তারই একটি। গঙ্গার ভাঙনের পর ছিন্নমূল পরিবারগুলি সেই ২০০২ সাল থেকে হামিদপুর চরেই বসবাস শুরু করে। চরে থাকলেও, সেখানে রোজগারের তেমন কোনও সংস্থান নেই। তাই চরবাসীদের বেশিরভাগই রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে চলে যান। এদিকে আবার পরিচয়পত্র না-থাকায় অনেক সময়ই পুলিশ তাঁদের বাংলাদেশি বলে জেলে পুরে দেয়। তাই নিজেদের পরিচয়পত্রের দাবিতে সেই থেকেই সোচ্চার হন তাঁরা। দাবি-আদায়ে লাগাতার আন্দোলনও শুরু করেছিলেন। কিন্তু সরকারের নিস্পৃহতায় এতদিন তাঁদের সেই দাবি পূরণ হয়নি। ২০০৫-এ তাঁদের আন্দোলনে সামিল হয় এলাকার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জোরালো হয় দাবি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁদের দাবি মেনে নেয় সরকার। শনিবার তাঁদের সেই দাবি-আদায়েরই প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হল।

সচিত্র পরিচয়পত্র না-থাকায় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই ইতিমধ্যে ঝাড়খণ্ডের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ভোটার কার্ড থাকলেও, তাঁদের জমি কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। তাই নিজের রাজ্যের পরিচিতি দাবি করেছেন সকলে। তবে রোজগারের আশায় চর থেকে প্রায় ১২-১৪টি দল ধান কাটতে বিহার-নেপাল সীমান্তে গিয়েছেন। এই প্রতিটি দলে ২৪-৩০ জন করে চরবাসী ছিলেন। কাজ ছেড়ে শুনানিতে আসতে পারেননি প্রায় ৪০০ জন চরবাসী।

তা হলে তাঁদের নাম কি উঠবে না ভোটার তালিকায়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক জানান, যাঁরা এতদিন উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁদের জেলা প্রশাসনিক ভবনে উপস্থিত হয়ে শুনানিতে অংশ নিতে হবে। কারণ, আগামী বছরের ৫ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তাই ডিসেম্বরের মধ্যে শুনানির কাজ শেষ করতে হবে।'

– একদিন ০৫.১২.১০

নাগরিকত্ব পেতে চলেছে চরের বাসিন্দারা

রূপথে সংবাদ : অবশেষে হামিদপুর চরের বাসিন্দারা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকত্ব পেতে চলেছে। ৩ নভেম্বর অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুন সিংহরায়ের তত্ত্বাবধানে জেলার ভোটার তালিকায় তাদের নাম তোলার উদ্যোগ শুরু হল।

কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের অধীন গঙ্গার এই চরের বাসিন্দাদের এত দিন কেনো ভোটাধিকার ছিল না। পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাচর ভাঙতে ভাঙতে এক সময় গঙ্গা চরে জেগে উঠেছিল এই চর। ভিটে মাটি হারিয়ে ভাঙন দূর্গতরা ভাসতে ভাসতে জীবন জীবিকার স্বার্থে একদিন ঘর বেঁধেছিল এই চরে। কিন্তু তারপর থেকে নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডের' বাসিন্দাই হয়ে ছিল তারা। গঙ্গার মাঝখানে জেগে ওঠা এই চরের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের বিবাদ চলছিল। আর তার জেরে সমস্ত রকম নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলা প্রশাসন তাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিল। প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি চরবাসীরা। এদিন ৯০৭ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রী সিংহরায় জানান, বাকিদের জন্য আবার নতুন দিন ধার্য হবে।

– রূপান্তরের পথে ০৫.১২.১০

খাদ্যের অধিকার

■ পার্থসারথি দাশ ■

প্রাণীমাত্রেরই জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন খাদ্যের। খাদ্য ছাড়া তার জীবন বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও পুষ্টি খাদ্য ছাড়া হবার নয়। যন্ত্রপাতির চলনশক্তি যেমন তেল ছাড়া চলবার নয় তেমনি প্রত্যেক প্রাণীর জীবনও খাদ্য ছাড়া বাঁচবার নয়। ফলে খাদ্য তার মৌলিক চাহিদা। মানুষেরও তাই খাদ্য ছাড়া জীবন বাঁচানো অসম্ভব। সে কারণে মানুষেরও মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পাবার অধিকার অবশ্যই আছে।

ভারত স্বাধীন হবার পর স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও প্রত্যেকটি নাগরিকের উদর পূর্তির প্রয়োজনে খাদ্য পাবার অধিকার অর্জিত হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে বলেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও 'হাম দো হামারা দো' নীতি মানলেও জনসংখ্যাকে স্থিতাবস্থায় রাখবার উপায় নেই। সে কারণে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়ার দায়িত্ব স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর বর্তায়।

দেশ যেহেতু অধিক মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালিত সেহেতু অধিকাংশ মানুষ শোষণমূলক উৎপাদনের কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। দেশের বেশিরভাগ সম্পদ শতকরা ১০/১২টি পরিবারের করায়ত্ত। শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি মুনাফার পাহাড় গড়বার জন্যও অধিকাংশ মানুষকে শোষণ করবার জন্য এ দেশের শাসক গোষ্ঠীকে নিজেদের পক্ষে রাখবার নানা কৌশল ফাঁদে। শাসক সম্প্রদায়ও সে ফাঁদে আটকে দেশের আশি-নব্বইভাগ মানুষের বাঁচবার অধিকারকে পর্যুদস্ত করে। তার ফলস্বরূপ সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক মজদুর মেহনতী মানুষ চাহিদা অনুযায়ী ন্যূনতম খাদ্যটুকুও সংগ্রহ করতে হিমসিম খায়। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমানাধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সরকার সমস্ত নাগরিককে তার ন্যূনতম খাদ্যের দাবী পূরণে দায়বদ্ধ। কিন্তু কিছুদিন থেকে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—অনুর্বর ঊষর জমি অঢেল পড়ে থাকা সত্ত্বেও শিল্পের ধুয়া তুলে উর্বর দো-ফসলা-তে-ফসলা কৃষিজমি স্বদেশি ও বিদেশি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর দেশের সরকারগুলি। কোথাও মোটর গাড়ির কারখানা, ইস্পাত কারখানা, কোথাও জীবজগতের প্রাণান্তকর কেমিকেল হাব, মানুষকে পশুর মতো খাটানোর সেজ বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন, আবার কোথাওবা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে। আর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ—যাঁদের জীবিকা কৃষিকাজ তাঁরা হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু হয়ে জীবন জীবিকা হারিয়ে অনিশ্চিত জীবনে মৃত্যুর দিন গুনছে।

বিকল্প উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস করে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হলেও ফাটকাবাজ-মজুতদার-মুনাফাখোরদের পাল্লায় পড়ে কৃষক ও কৃষি উৎপাদন মার খাচ্ছে। অত্যাবশ্যকীয় পন্য আইন থাকা সত্ত্বেও গদীবাজ সরকারগুলি সাধারণ মানুষকে কোনো সুরক্ষা দিচ্ছে না। খাদ্য শস্যের সুষম বন্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ বন্টনেও দুর্নীতির আখড়া। মানুষের খাদ্যের অধিকার পর্যুদস্ত। কম্পুটারের যুগ দেখিয়ে সরকার প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অবধারিত পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বেশিরভাগ মানুষকে।

প্রাথমিক শিক্ষার একাল সেকাল *১ পাতার শেষাংশ.....*

আবার প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ যেখানে ঠিকমত দেওয়া যাচ্ছে না তার সমান্তরালভাবে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯১ সালে ডঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে একটি কমিশন বসানো হয়। এটি মিত্র কমিশন নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালে কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করে। ওই রিপোর্টে বিদ্যালয় পরিকাঠামো, পাঠক্রম, মিড-ডে-মিল, শিক্ষকদের শিক্ষাদান সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয় প্রকাশ করা হয়। ১৯৯২ সালে মিত্র কমিশনের সুপারিশসমূহ সরকার ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অনেকটাই গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতে ৬টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রচলিত তা প্রণীত হয় ১৯৭৯ সালে হিমাংশু বিমল মজুমদারের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার নিযুক্ত এক শিক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে। এই কমিটি গঠিত হয় ১৯৭৪ সালের একটি আদেশনামার ভিত্তিতে [আদেশনামা নং ১৪৩৫ ইডিএন (পি)]। মিত্র কমিশন প্রাথমিকে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানোর বিরুদ্ধে থাকলেও সারা রাজ্যে প্রাথমিকে ইংরেজি পড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের উপর চাপ আসতে থাকে। ওই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে রাজ্য সরকার ১৯৯৮ সালে পবিত্র সরকারের উপর দায়িত্ব দেয় প্রাথমিকে ইংরেজির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সমীক্ষা করার। মিত্র কমিশনের সুপারিশ মেনে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিতভাবে ২য় শ্রেণির মধ্যভাগ থেকে এবং তৃতীয় শ্রেণি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হয়। সরকারিভাবে উল্লেখ করা হয় - The teaching learning method of english study at the Primary level veers round an electric approach (Drawing on components from various methods) of the various methods of second language study. In the main, the Semantico-Frammatico method (Vocabulary cum structure-based method, propounded by D.A Wilkins) needs be followed since this method has a direct bearing on the functional-communicative method of English study at the secondary level.

আর ৩/৪ বছর পর প্রথমশ্রেণি থেকেই ইংরেজির পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়। এখানে খুব সহজভাবে ছবি দেখে শিক্ষক শিক্ষিকার নির্দেশে কয়েকটি ইংরেজি নাম বলতে শেখা দিয়ে শুরু করে ইংরেজি বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিতি দিয়ে শুরু করে অনুশীলনের মাধ্যমে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন অনুশীলনীর মাধ্যমে খেলার ছলে শেখার অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এইভাবে বেশ কয়েক বছর চলার পর ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলকাতার বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ইংরেজি ভাষা ইংরেজি ভাষাতেই শিক্ষাদানের কথা বলা হয়। এবং সেইভাবেই পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়। এই সময় সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে বিশাল মতভেদ ও বিতর্ক দেখা দেয়। এক শ্রেণির শিক্ষাবিদ্‌রা জানান, সমাজের সকলস্তরের মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করাতে প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়। কারণ ইংরেজির ভয়ে অনেক শিশু প্রাথমিকস্তর পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারতো না। ফলে প্রাথমিকেই ব্যাপকহারে 'স্কুলছুট' হত। তাঁরা আরও বলতে শুরু করলেন বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির সম্প্রসারণের ফলে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়েছে একথা হয়তো ঠিক—কিন্তু তার ফলে জনশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বা শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি অবশ্যই পালটে যায়নি। সর্বস্তরের শিশু-কিশোরদের কাছে এই ভাষাটি আয়ত্ত করাও সহজসাধ্য হয়ে ওঠেনি। কোনও বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হলেই তার পাঠগ্রহণ শৈশবেই শুরু করতে হবে এমন চিন্তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। সুতরাং প্রশ্নটা ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব নিয়ে নয়, এর পাঠারম্ভের বয়স ও পর্যায় নিয়ে। এখানে একটি অকাট্য বক্তব্য হল, নিজের মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তি জন্মাবার আগে একটি বিদেশি ভাষা শেখা প্রায় অসম্ভব। সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য থেকে যদি আমরা বিচ্যুত না হই, তাহলে একথা মানতেই হবে যে, বিভিন্ন ভাষার পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশুরা নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমেই ইংরেজি শিখবে। সর্বশিক্ষার সর্বনিম্ন স্তরে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ইংরেজির মাধ্যমে ইংরেজি শেখানোর চিন্তা বাতুলতা মাত্র। প্রথম ভাষার পথ বেয়েই শিশুকে দ্বিতীয় ভাষার রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে।

আর এক গোষ্ঠীর মানুষ বলতে থাকেন এ রাজ্যে ইংরেজি চর্চার পরিমণ্ডলে বাস করা ছেলেমেয়েরা খুবই নগণ্য সংখ্যায়। কিন্তু বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কাছে ইংরেজি অতিশয় কঠিন বিষয়। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেও যখন আলোকপ্রাপ্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করত, তখনও সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে এই বিষয়টি ছিল পরীক্ষার আতঙ্ক। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অসাফল্যতা ছিল ইংরেজিতে। বর্তমানে সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সন্তানরাই প্রাথমিক স্কুলগুলিতে আসে। তাদের পিতামাতা উভয়ই দিনমজুর এবং বাড়িতে ইংরেজি চর্চার কোনও সুযোগই নেই। সুতরাং ওই সকল সমাজের সিংহভাগ মানুষদের কাছে ইংরেজি বিভীষিকার বিষয় হয়ে উঠবে। আর ডাইরেক্ট মেথডে ইংরেজি শেখালে তো কোনও কথাই নেই।

ওই সকল কথা গুরুত্ব না দিয়েই রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গত তিনবছর ধরে ডাইরেক্ট মেথডে ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায়। এ রাজ্যে আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কোনও সঠিক পদ্ধতি বা কমিশন গঠিত হয়নি। দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে শাসন করলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য রাজ্যব্যাপী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কোনও কোনও জেলায় ১২/১৩ বছরও মামলা চলার জন্য প্রাথমিকে নিরোগ বন্ধ থেকেছে। কখনও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে আদেশনামা বার করে যোগ্যতর প্রার্থী চাওয়া হয়েছে। আবার কখনও দলীয় সমর্থকদের নিয়োগের পথ সুগম করতে প্রশিক্ষকদের পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন ৫৭ এস.ই.(আই) / ১০ পার- ১/৯৯ তাং ১৫.১.০২ নির্দেশাবলীর দ্বারা রাজ্যসরকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাড়া অন্য প্রার্থীদের নিয়োগ বন্ধ রাখে। আবার ২/৩ বছর পরেও সেই নির্দেশ উঠিয়ে দিয়ে মাধ্যমিক পাশ যে কেউ শিক্ষকতা পেশা গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে এ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সরকার ভেবেছেন প্রাথমিক শিক্ষা এমন একটা বিষয় যা অন্য কোনও পেশায় যার সুযোগ পান না তাঁরা এটা ভালভাবেই করতে পারবে। ফলে জনগণনা কর্মী, ননফর্মাল এডুকেশন কর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মী, জমিহারা—তাঁদের শিক্ষার মান যাই থাকনা কেন এখানে বহাল তবিয়তে নিয়োগ পেয়েছেন।

এর ফলে ডাইরেক্ট মেথডে ইংরেজি পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যেরকম ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা দরকার একমাত্র প্রাক্তন সমরকর্মী ছাড়া অন্যদের খুব কম সংখ্যকই আছে। ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি পাঠদানের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রতি সার্কেলে যে প্রশিক্ষণ চলে সেখানে যে কেউ উপস্থিত থাকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এই প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে বছরের বহু সময়ই স্কুল ফাঁকা থাকছে। আবার যে স্কুল থেকে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে সেই স্কুল তো আরও বেশি ক্ষতির স্বীকার। অভিভাবকরা প্রশ্ন করছেন স্কুল ফাঁকা রেখে বছরের পর বছর শিক্ষকরা কি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন? এছাড়া, জনগণনা, ভোটের কাজে লিষ্ট তৈরি করা, মিড-ডে-মিল থেকে শুরু করে সর্বশিক্ষার কল্যাণে প্রায়ই গোছা গোছা তথ্য দেওয়া, রেশন ডিলার, পঞ্চায়েত সদস্য, এম আই অফিস, বিডিও অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকদের যখন-তখন ছোটাছুটি করতে হয়। শিক্ষকদের প্রথম যে কাজ বিদ্যালয়ে প্রতিদিন পঠন পাঠনের সেই কাজেই তাঁদের সময় দেওয়া হয় না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমানে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। যাঁদের অর্থনৈতিকভাবে বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর উপায় নেই তাঁরাই বাধ্য হয়ে এই ধরনের স্কুলগুলিতে পাঠাচ্ছেন। এমন কি আজ প্রাথমিক শিক্ষকরাও তাঁদের সন্তানদের প্রাথমিক স্কুলে পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না। ফল প্রাথমিক শিক্ষা বিপর্যস্ত।

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত। দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ: ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান: ২ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য